بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১২ অক্টোবর ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১২ অক্টোবর ২০১২-এর (১২ তাবূক, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবীদের ঘটনাবলী বর্ণনা করি তখন যে সাহাবীর ঘটনা বর্ণীত হয় তাঁর সন্তান ও বংশধররা আনন্দের সাথে চিঠি লিখেন এবং দোয়ার জন্যেও বলেন - হুযূর দোয়া করুন, আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহ বা প্রমাতামহ, দাদী ও বড় দাদীরা যুগ ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আমাদেরকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সেই সম্মান ধরে রাখতে পারি। তাঁরা সেই যুগ পেয়েছেন এবং যুগ ইমামের সাহচর্যে সরাসরি কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন। কিন্তু একটি ঘটনায় আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি, যখন শুনেছি কেউ কেউ এমনও আছে যারা তাদের জ্যেষ্ঠদের বা সম্মানিত পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আপত্তি করে বলে, তারা পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে ভুল করেছেন। সেই প্রবীণদের অবস্থা ও ঘটনা সম্বন্ধে সঠিকভাবে না জানার কারণে তাদের মনে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সেসব বুযূর্গের ঘটনাবলী যখন আমি বলা শুরু করেছি তখন এমন ভুল ধারণা পোষণকারী একটি পরিবারের একজন আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেন, অমুক বুযূর্গের ঘটনা বর্ণনার কল্যাণে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে যেসব ভুল ধারণা বা বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন ছিল তা আপনি দূর করে দিয়েছেন। অতএব, পবিত্র সাহাবীদের সম্পর্কে ঘটনাবলী বর্ণনার কল্যাণে কোন কোন বুযূর্গ সম্পর্কে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মনে যেসব ভুল ধারণা থাকে তা দূরীভূত হয় এবং এটি তাঁদের উত্তরসূরীদেরকে জামাতের কাছে আনার কারণ হয়। এজন্য আমি বারবার বলেছি এবং আমার পূর্বের খলীফাগণও বারবার বলেছেন, বিশেষ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী বর্ণনা করা শুরু করেছিলেন। কিছু ঘটনা বর্ণনার পর পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের প্রবীণদের ঘটনাবলী, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করতে থাকা উচিত। যাতে জামাতের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠে আর তাদের যেন উত্তম তরবীয়ত হয়। এখানে একথাও বলে রাখি, জামাতের কিছু সদস্য বা কর্মকর্তার আচরণের কারণে সাহাবীদের পরিবারের কোন কোন সদস্য জামাত থেকে দূরে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তারা বলে বসে, আমাদের প্রবীণরা ভুল করেছিলেন।

অতএব এমন লোকদের ছোটখাট বিষয় দুঃখিত হবার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে এবং যারা এ সমস্যার কারণ তাদের জন্যেও দোয়া করা উচিত। সর্বদা মনে রাখবেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক গবেষণা করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি নির্দেশনা পেয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের ভুল থাকতে পারে, কেননা আল্লাহ্‌র সাথে এদের সম্পর্ক এত গভীর নয় যেমনটি ছিল পূববর্তী সেই সম্মানিত লোকদের। অতএব, সর্বদা একথা মনে রাখবেন, তারা ভুল করেন নি। ন্যায়ের দাবী হল, আপনারা নিরপেক্ষভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন সর্বদা সরল সোজা পথে পরিচালিত করেন এবং কখনো যেন এমন অবস্থা সৃষ্টি না হয় যা তাদের বা আমাদের কাউকে ধর্ম থেকে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এমন লোকেরা যদি আত্মবিশ্লেষণ করেন তবে তারা বুঝতে পারবেন, তাদের অহমিকা বা নির্বুদ্ধিতা এসব ছোটখাট বিষয়কে ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

অতএব সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে থেকে যারা ধর্ম থেকে বা জামাতী ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে সরে গেছে, তা যে কারণেই হোক না কেন বা যাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও অহংকার তাদের উপর ছেয়ে আছে, তাদের উচিত তারা যেন সঠিক পথে চলার জন্য সর্বদা দোয়া অব্যাহত রাখে।

আপনারা আপনাদের প্রবীণদের অনুগ্রহসমূহ স্মরণ রাখবেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আমাদের রক্তে এই কল্যাণধারাকে প্রবাহিত করা। আল্লাহ্ করুন, সাহাবীদের উত্তরসূরীরাও যেন চিরকাল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করেন আর তাদের মনে যেন কোন প্রকার অভিযোগ দানা না বাঁধে।

আজ এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি সাহাবীদের (রা.) ঘটনাবলী বর্ণনা করছি। প্রথম ঘটনাটি নূর মুহাম্মদ সাহেবের ছেলে হযরত মুহাম্মদ ফাযেল সাহেব (রা.)-র। তিনি বলেন, একরাতে এশার নামাযের পর আমি মৌলভী সুলতান আহমদ হামীদ সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! হযরত মির্যা সাহেব যে মাহ্‌দী ও মসীহ্ হবার দাবী করেছেন যদি তিনি সত্য দাবীকারক হয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আমাদের দেশে আবির্ভূত করা সত্ত্বেও আমরা যদি তাঁকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হই তা হলে কি হবে? আমরা কি সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার মত কষ্টটুকুও সহ্য করতে পারি না? মৌলভী সাহেব যেহেতু পরিস্কার মনের অধিকারী এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন তাই তিনি উত্তরে বলেন, অবশ্যই যাওয়া উচিত। আমি তাঁর কাছ থেকে (কাদিয়ান যাওয়ার) দৃঢ় অঙ্গীকার নিলাম। মৌলভী সাহেব চলে গেলেন এবং আমি শুয়ে পড়লাম। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি বলেছেন, মৌলভী সাহেব সেই বৈঠক ছেড়ে চলে গেলে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। তিনি লিখেন, **'আমি স্বপ্নে দেখলাম, খুব সুন্দর একটি বাড়ি, তাতে খুব সম্ভব চারটি দরজা রয়েছে, আর বাড়িটি দক্ষিণ মুখী এবং এর পূর্ব পাশে একটি মাঠ, যাতে সাদা পোষাক পরিহিত সম্মানিত লোকদের একটি বড় সমাবেশ চলছে। আর তাদেরকে ঐশী গুণাবলীর অধিকারী বলে মনে হল, তারা দলবদ্ধভাবে বসে আছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় শতাধীক। আর আমিও তাদের মাঝে বসে আছি। ইতিমধ্যে এ বাড়ির পূর্ব দিকের দরজা থেকে জ্যোতির্ময় চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বাহিরে আসলেন, যিনি সাদা দাড়ি ও পাগড়ী পরিহিত ছিলেন, যার ঔজ্জ্বল্য এখনো আমার চোখে ভাসছে।**

তিনি বাহিরে আসেন এবং সেই সমাবেশের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। তখন আমি সেই সমাবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। সেই জ্যোতির্মন্ডিত চেহারা বিশিষ্ট লোকটি আমার দিকে শাহাদত অগুলি নির্দেশ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাথে সাথে আমার মনে উদয় হল, এই সম্মানিত বুযূর্গ মহানবী (সা.)। এরপর আমি দরূদ পড়তে শুরু করলাম এবং আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।' আমি এত আনন্দিত ছিলাম যে, আর ঘুমাতে পারলাম না। আমি উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম, কখন সকাল হবে আর কখন আমি মৌলভী সাহেবকে এ স্বপ্ন শুনাব। সকালে মৌলভী সাহেব যখন আসলেন তখন আমি নামায শেষ করে তাকে এই স্বপ্নটি শুনালাম, তিনি শুনে বললেন, তুমি খুবই সৌভাগ্যবান।

হযরত শেখ আসগর আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, তবলীগের সময় এভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ, এশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে এভাবে দোয়া করা বাঞ্ছনীয়, হে আমাদের প্রভু! এ জামাত যদি সত্য হয় তবে আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ কর। তিনি বলেন, ১৯০০ ইং সালে চাকরী উপলক্ষে আফ্রিকা যাওয়ার সময় আমি আমার এক পুরোন বন্ধুকে আমার সেবক হিসেবে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার নাম ছিল, নেক মুহাম্মদ সাহেব, আর তিনি গুজরাত জেলার সারায়ে আলমগীর নিবাসী ছিলেন। তবলীগ করার সময় আমি তাকে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা পত্রটি বলেছিলাম। কথামত তিনি এভাবেই অনুশীলন করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বপ্নেযোগে নিম্নবর্ণিত দৃশ্য দেখান। **'তিনি তার সারায়ে আলমগীরের বাড়িতে অবস্থান করছেন আর তার মরহুম পিতাও তার সাথে আছেন। তারা যে কক্ষে অবস্থান করছিলেন সেটি খুবই আলোকিত হয়ে গেছে আর দেখা যাচ্ছে, আকাশ থেকে একটি আলোর তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে যা কক্ষটিকে আলোকিত করছে এবং এরই সাথে সুদর্শন ও পবিত্র চেহারা বিশিষ্ট এক বুযূর্গ দৃশ্যপটে আসেন। আর নেক মুহাম্মদ সাহেবের সম্মানিত পিতা তার ছেলেকে সম্বোধন করে বলেন, ইনি ইমাম মাহদী। পরে পিতা পুত্র দু'জনই হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এতো সুন্দর দৃশ্য দেখার পর তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।'** সকাল বেলা তিনি আমাকে এ অবস্থার কথা জানান এবং তার বয়আতের জন্য চিঠি লিখতে অনুরোধ করেন। ফলে আমি তার বয়আতের অনুরোধ করে চিঠি লিখে দেই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার পরিবারের সবাই আহমদী।

উমর বখশ্ সাহেবের ছেলে হযরত মাস্টার মাওলা বখ্শ সাহেব (রা.) বলেন, তিনি পটিয়ালা রাজ্যের মাদরাসা সেঙ্গুহ্নীর হেড মাস্টার ছিলেন। ভাদ্রমাসে (আগষ্ট মাস যা বর্ষার পর আসে) মৌসুমী ছুটি হয়, তখন আমার হুযূর (আ.)-এর কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হল। আমার ছেলে মরহুম আব্দুল গাফ্ফারের বয়স তখন দুই বছর ছিল। তার শরীরে ফোড়া উঠেছিল যা শুকোচ্ছিল না। আমি এর প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে সেখান থেকে রওয়ানা দেই এবং সারহিন্দের মৌলভী মুহাম্মদ তাকী সাহেবকে সাথে নিয়ে হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বয়আত করি। এখানে প্রায় এক মাস অবস্থান করে যখন আমি বাড়ি পৌঁছি তখন আমি আমার ছেলেকে পুরোপুরি সুস্থ্য দেখতে পাই। আমার স্ত্রী বলে, আমি একে গোসল করানো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন ফোড়াগুলো ভালো হয়ে গেছে।

হযরত কাযী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেন, ১৮৯৮ইং সালের দিকে আমি একটি সত্য স্বপ্নে দেখেছিলাম, **'আমি একটি উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গে পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার দু'হাত দুই দিকে যথা সম্ভব প্রসারিত করে রেখেছি। আমার ডান হাতের তালুতে সূর্যের সোনালী গোলক স্ফটিকের ন্যায় ঝলমল করছিল এবং বাম হাতের তালুতে রয়েছে চাঁদের গোলক যা (আমার হাত থেকে) তিন ফুট উঁচুতে রয়েছে। পূর্ব দিক থেকে একটি নদী পাহাড়ের দক্ষিণ পাশ ঘেষে বয়ে গেছে। নদী ও পাহাড়ের মাঝে একটি প্রশস্ত সবুজ শ্যামল মাঠ।'** পরে এ স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা বুঝলাম তাহল 'পাহাড় অর্থ মান-সম্মান লাভ, সূর্য অর্থ মুহাম্মদ (সা.) এবং চাঁদ অর্থ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি পূর্ণ চাঁদ ছিলেন। নদী অর্থ ঐশী জ্ঞান যা পূর্ব দিক আর তা পশ্চিমকে কল্যাণ মন্ডিত করবে। আর হাতের তিন ফুট উপরে চাঁদ থাকার অর্থ তিন বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করব। (তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ১৮৯৮ইং সালে আর) ১৯০১ইং সালে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পাটিয়ালার সাবেক পুলিশ ইন্সপেক্টর হযরত শেখ মুহাম্মদ আফযাল সাহেব (রা.) বলেন, ১৯০০ইং সালের গ্রীস্মকাল, ডাক্তার হাশমতুল্লাহ্ সাহেব তখন একজন সেবকসহ বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যান। মাগরিব নামাযের নিকটবর্তী সময় তিনি কাদিয়ান পৌঁছেন। কাদিয়ানের কাঁচা মেহমানখানায় বিছানাপত্র রেখে তিনি মসজিদে মুবারক-এ যান। হযরত মির্যা সাহেব মাগরিবের নামায পাড়ার জন্য বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন যেহেতু কিছুটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে বেশ মোটাসোটা মনে হল। আমি শহুরে আবহওয়ায় বড় হয়েছি শয়তান মনকে বিভ্রান্ত করল, যে মোটা হবে না কেন? নাউযুবিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্বন্ধে তার এমন মনে হয়েছে, অন্ধকারের ঠিকমত দেখা যাচ্ছিল না, শয়তান তার মনে ভ্রান্ত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে যে, মোটা হবে না কেন, মানুষের মাংস তো আর কম খায় না! বাড়ির ভেতর থেকে অনেক মহিলার কথার আওয়াজ এলে মনের মাঝে পুনরায় কুধারণা সৃষ্টি হল, শয়তান বিভ্রান্ত করল, তাঁর চরিত্রেরই বা কী বিশ্বাস আছে? প্রবৃত্তির সাথে অনেক যুদ্ধ করি, সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে প্রবৃত্তি নতুন নতুন নোংরা ধারণার উম্মেষ ঘটাচ্ছিল। আমি নামাযে দোয়া করলাম, হে আমার খোদা! এ ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে যেন আমি এখান থেকে অসফল ও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে না যাই। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেলাম না। নামাযের পর অতিথিশালায় ফিরে এলাম এবং এমন অবস্থায় বয়আত করা ঠিক হবে না বলে বয়আত না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এশার নামায পড়েছি কি পড়ি নি আর পড়লেও কোথায় পড়েছি তা মনে নেই। ব্যথিত হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত দু'টো বা তিনটের দিকে এক ব্যক্তি আমাকে গলা ধরে খাটিয়ার উপর দাঁড় করিয়ে দিল। অর্থাৎ তিনি স্বপ্নে এ দৃশ্য দেখছেন। এতো জোরে গলা চেপে ধরেছে যে, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আর সে বলল, তুই জানিস না- মির্যা কে? ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং নিজ দাবীর ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী। সাবধান যদি অন্য কোন বাজে চিন্তা করিস! এরপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে চৌকিতে ফেলে দিল। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ছিল। তিনি বলেন, ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন আমার চোখে অশ্রু ছিল এবং গলা খুব ব্যথা করছিল যেন আসলেই কেউ আমার গলা চেপে ধরেছিল, যদিও এসব কিছু স্বপ্নেই ঘটেছিল। মনকে বললাম, মির্যা সাহেবের সত্যতা সম্বন্ধে এখনো কোন সন্দেহ আছে কি? মন বলল, একদম নেই। সকালে মির্যা সাহেবকে দেখে বুঝলাম, যেন আকাশ হতে কোন ফিরিশ্তা নেমে এসেছেন অথচ তিনি সাধারণ

গড়নেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহারে প্রাণ উজাড় করতে ইচ্ছে করছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন সামনে আসতেন তখন অবলীলায় কান্না পেত, যেন হুযূর প্রেমাস্পদ আর এই অধম প্রেমিক। আমি প্রসন্ন চিত্তে বয়আত করি। খোদা তা'লা আমাকে শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত করে এক প্রকার বলপুর্বক মসীহ্‌র দ্বারে এনে দাঁড় করিয়েছেন। নতুবা আমি তো প্রায় পথ হারিয়েই বসেছিলাম।

হযরত কায়েম উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখি, **'আমার গ্রামের মসজিদে আমি নামায পড়ে উঠেছি, এমন সময় লোকেরা বলাবলি করছে, ভাইসব! এমন এক বিপদ এসেছে যা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করবে। এ কথা শুনে আমারও মনে হল এটি আমাদের সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে। কালো রঙের কাঠের মতন কি একটা যেন খেতজুড়ে দেখা যাচ্ছে। আমি লোকদের বললাম, নিশ্চয় এটি আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। তোমরা কিছুটা হলেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর! তখনই এগুলোর (অর্থাৎ বিপদগুলোর) দু' একটি আমার ডান হাতের আঙ্গুল ধরে ফেললে আমার মনে হল এটি আমাকে আর ছাড়বে না। আমি সেই কীটকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি খোদার পক্ষ থেকে এসেছ? কীটটি বলল, হ্যাঁ। আমি একে জিজ্ঞেস করলাম, মির্যা সাহেব সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? সেটি বললো, তিনি সত্যবাদী। তুমি যদি মির্যা সাহেবকে না মান, তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে খেয়ে ফেলব কারণ, তিনি সত্যবাদী। মির্যা সাহেব সত্যবাদী, এ বাক্যটি তিন বার উচ্চারিত হল। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।'** তিনি বলেন, আমি সকালে উঠে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, জুমুআ কবে? তিনি বললেন পরশু। এরপর আমি জুমুআর দিন গিয়ে হযরত সাহেবের হাতে বয়আত করি।

মিয়াঁ আমীর বখ্‌শ সাহেব (রা.)-এর পুত্র— হযরত আল্লাহ্ রাখ্‌খা সাহেব (রা.) বলেন। (তাঁরা দু'জনই সাহাবী ছিলেন)। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। এ স্বপ্নের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য আমি নারওয়াল নিবাসী মরহুম মৌলভী আহমদ দ্বীন সাহেব সহ কাদিয়ান আসি। মাসের নাম স্মরণ নেই তবে, গরমকাল ছিল। ফজরের নামাযের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকে আসন গ্রহণ করেন। সে সময় নারওয়াল নিবাসী মরহুম মৌলভী আহমদ দ্বীন সাহেব তার তিনশব্দ বিশিষ্ট পংক্তির সমন্বয়ে রচিত কবিতা হতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কিছু পড়ে শুনালেন। এতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবী এবং সে যুগের লোকদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। মৌলভী সাহেব এতে একথাও উল্লেখ করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), মহানবী (সা.)-কে তার পিঠে বহন করে সওর গুহায় নিয়ে গিয়েছিলেন। একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! মহানবী (সা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.) বহন করে নিয়ে যান নি বরং মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে এটি ছাপানোর অনুমতি দেন এবং ভেতরে চলে যান।

হযরত মুহাম্মদ ফাযেল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিকে বয়আত করার প্রতি আমার হৃদয়ে ছিল পরম ব্যাকুলতা আর অপর দিকে হযরত আকদাস (আ.)-এর আধ্যাত্মিকতা আমার হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা বর্ণনাতীত তাই হযরত মাখদুমুল মিল্লাত অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলাম, [হুযূর (আ.)-এর নিকট] আমার বয়আত গ্রহণের জন্য আবেদন করুন। প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর হযরত মাখদুমুল মিল্লাত আমার বয়আত গ্রহণের কথা হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থাপন করতেন, তিনি (আ.)

বলতেন, আগামীকাল। এতে আমার বয়আত করার দুর্বার আকাঙ্খা এমন পর্যায়ে পৌছে যেত, তিনি একটি ফারসী পংক্তি পড়েন তাহল, **‘ওয়াসল চুঁ শুওয়াদ নাযদীক - আতশে শওক তেজতার গারদাদ’** অর্থাৎ প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের সময় যত ঘনিয়ে আসে মিলন বা সাক্ষাতের অগ্নি ততই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তিনি বলেন, এক সপ্তাহ পর আমার মন বলল, আমি তো স্বপ্নে বয়আত করেই ফেলেছি, তাই বিদায় না নিয়েই চলে আসলাম। অর্থাৎ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরও যখন বয়আতের আবেদন গৃহীত হয়নি তখন আমি ভাবলাম, আমি তো স্বপ্নে বয়আত করেই ফেলেছি, তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই আমি নিজ শহরের বাড়িতে ফিরে আসি। তিনি বলেন, বাড়িতে এসে আমি ভীষণ অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়লাম। এক মাস পর আবার কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের চিকিৎসালয়ে পৌছলে, তিনি আমাকে দেখে মুচকি হেসে বলেন, যে ব্যক্তি যুগ ইমামের অনুমতি না নিয়ে যায় তার অবস্থা এমনই হয়। তখন আমি বুঝতে পারলাম, যুগ ইমামের বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া সঙ্গত হয় নি। এরপর হযরত সাহেবের (আ.) সাথে সাক্ষাত করি কিন্তু বয়আত নেয়ার জন্য আমি আর পীড়াপীড়ি করি নি। আমার হৃদয় প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হতে থাকে। অবশেষে বাইশ দিন পর বৃহস্পতিবার, মাগরিব নামাযের পর হুযূর (আ.) নিজেই বললেন, ‘মুহাম্মদ ফাযেল বয়আত করে নাও।’ আমি বয়আত করি আর এটি ১৮৯৯ সনের শেষ অথবা ১৯০০ সনের শুরুর দিকের ঘটনা ছিল।

হযরত মিয়াঁ গোলাম আহমদ বাফানদা সাহেব বর্ণনা করেন, আমি হানাফী ছিলাম পরে ওয়াহাবী হয়ে গেলাম কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলাম না। মনে এই বাসনাই ছিল, আল্লাহ তা’লা হযরত ইমাম মাহদীকে আবির্ভূত করলে আমি তার সৈন্য দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। একবার আমাকে স্বপ্নে হযরত আকদাস এর পবিত্র চেহারা দেখানো হয়। আমি কাদিয়ান গেলে তাঁর (আ.)-এর চেহারা হুবহু তেমনই (স্বপ্নেদেখা চেহারার মত) দেখতে পেলাম এবং বয়আত করে নিলাম।

হযরত হেকীম আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) তার পিতার বয়আত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের এখানে আলাউদ্দীন সাহেব নামে এক মৌলভী বসবাস করতেন। নিকটেই একটি মসজিদও ছিল। আমার পিতা তার কাছে পড়তেন। একদিন এশার নামাযের সময় আমার পিতা ওযু করতে করতে মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, মৌলভী সাহেব! আজকাল অনেক বেশী উল্কাপাত ঘটছে। এর কারণ কি? উত্তরে মৌলভী সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। আকাশে তাঁর আগমন উৎসব উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। আমার পিতা বলেন, কয়েকদিন পর আমি হযরত আকদাস (আ.) সম্পর্কে জানতে পেরে কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করি। ফিরে এসে মৌলভী সাহেবকে বললাম, আমি বয়আত করে এসেছি; আপনার কি ইচ্ছা? কিন্তু তিনি নিরব থাকেন। কিছুক্ষণ পর আস্তে করে বলেন, মিয়াঁ! কথা সঠিক কিন্তু আমি যে জগতপূজারী হয়ে গেছি। (হুযূর বলেন,) অর্থাৎ মৌলভীও আবার জগতপূজারীও!

হযরত মিয়াঁ রহীম বখ্‌শ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যেদিন অমৃতসরে আব্দুল হক গযনবীর সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুবাহালা অনুষ্ঠিত হয় সেদিন আমার পিতাও সেই মুবাহালায় উপস্থিত ছিলেন। আমার পিতা বলতেন, হযরত সাহেব যে সময় দোয়া করছিলেন তখন হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব জ্ঞান হারিয়ে

ফেলেন। (হুযূর ব্যাখ্যা করে বলেন), তিনি এত আকুল হয়ে সকাতর চিত্তে দোয়া করেন যে, তা তার সহ্যের বাহিরে চলে যায় আর এ কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার পিতা বলেন, হযরত সাহেব (আ.)-কে দেখে আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, তিনি এ জগতের মানুষ নন বরং তিনি একজন স্বর্গীয় মানুষ। আমার পিতা চভিন্ডায় ফিরে এসে স্বীয় গোত্রের লোকদের কাছে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সে এক অদ্ভূত জামাত, তারা সবাই ফিরিশ্‌তা তুল্য মানুষ। অতএব আমি, আমার পিতা, চাচা বরং বলা যায় আমাদের পুরো বংশ বয়আত করি।

হযরত চৌধুরী রহমত খাঁন সাহেব (রা.) তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, স্বপ্নে দেখলাম, **'আমি ঘর থেকে বেরিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চৌধুরী মওলা বখ্‌শ ভাট্টি, চৌধুরী গোলাম হুসেন, মৌলভী রহীম বখ্‌শ, মৌলভী শামসুদ্দীন, মৌলভী আলফ দ্বীন, মৌলভী এনায়েতুল্লাহ্, রহমত খাঁন জাট প্রমূখদের সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। তারা সে সময় বাজার থেকে এসেছিলেন। চৌধুরী মওলা বখ্‌শ সাহেব আমাকে বলেন, হযরত সাহেব স্বয়ং এখানে এসেছেন তাই এখন বয়আত করে নাও। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না? আমি তাদের সাথে গেলাম। এ দলটি প্রথমে চৌধুরী মওলা বখ্‌শ সাহেবের কূপে যান এরপর আমাদের কূপে, সেখানে হযরত সাহেব নামায পড়ান। নামায পড়ার পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।'** হযরত সাহেবের যে চেহারা আমি (স্বপ্নে) দেখেছি তা আমার হৃদয়ে এমনভাবে অঙ্কিত হয়ে যায় যা কখনও ভুলবার নয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি বাড়ি আসি। পথ খরচ নিয়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি আর সেখানে গিয়ে বয়আতের পর তিন দিন অবস্থান করি।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে কতককে বরং অনেক মানুষকে স্বপ্নের মাধ্যমে ধরে ধরে বয়আত করিয়েছেন।

হযরত মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ১৮৯২/৯৩ সালে বারাহীনে আহমদীয়া পড়েছি, আমার উপর এর বেশ প্রভাব পড়েছে। এরপর আমি হযরত সাহেবের এবং মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভীর রচণাবলী তুলনামূলক দৃষ্টিকোন থেকে পড়তে আরম্ভ করি। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইনের দলীল প্রমাণাদী দেখে স্পষ্ট মনে হয়, তা দুর্বল এবং আমার হৃদয়ে তা কোনভাবে রেখাপাত করে নি। হযরত সাহেবের দলীল অত্যন্ত জোরালো আর একইসাথে আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ মনে হত। ধীরে ধীরে ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমার মন-মস্তিস্কে এর গভীর প্রভাব পড়ে। অনুসন্ধান অব্যাহত রাখি এমনকি স্বপ্নের ধারা শুরু হয়ে যায়। ১৮৯৭ সালে আমি স্বপ্নে দেখি, **'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার সামনে, আমি পূর্বমুখী ছিলাম, আর হযরত আকদাসের পবিত্র চেহারা ছিল আমার দিকে। হযরত সাহেবের ডানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ছিলেন। আমার মনে হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বয়স ছিল ৮/৯ বছর। হযরত আকদাস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, পূর্বে যে আহমদ ছিলেন তিনি স্বাধীন নবী ছিলেন, অনুসারী নবী ছিলেন না অর্থাৎ তিনি কারো অনুসরণে আসেন নি আর বর্তমান আহমদ অনুসারী নবী অর্থাৎ এই আহমদ পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী; এই বলে হযরত আকদাস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এই আহমদ কে? তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন এই আহমদ তিনিই।'** এরপর আমি বয়আতের চিঠি লিখে পাঠাই এবং কিছুদিন পর কাদিয়ান গিয়ে সরাসরি বয়আত গ্রহণ করি।

হযরত নিযাম উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূরের কাছে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ- এর বাণীই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দূর-দূরান্ত থেকে আসত। অর্থাৎ হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে বলেছেন, **'আমার মসীহ্‌কে সালাম পৌঁছাবে'**-এই সালামের অধিকাংশই দূর-দূরান্ত থেকে আসত। তিনি বলেন, কিন্তু আমি এ ধারণাই করতাম, **'পীরাঁ নমী পারনান্দ মুরীদাঁ মি পারান্দ'**, অর্থাৎ পীর নিজে উড়েন না কিন্তু মুরীদরা তাঁকে উড়িয়ে থাকেন। প্রকৃত কথা হলো, তাঁর কোন কৃতিত্ব নেই, এরা সমবেত হচ্ছে বলেই তার অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশেষে আমি যখন মসজিদে আকসায় কেঁদে-কেঁদে দোয়া করলাম, আমার জীবন আমার আল্লাহর জন্য নিবেদিত হোক, তিনি এই অধমের কাছে অদৃশ্যের ভান্ডার উন্মোচন করে দিলেন যা লিখতে গেলে অনেক কাগজ লাগবে। এরপর আমি বয়আত করি আর সকল শয়তানী ধ্যান-ধারণা দূর হয়।

হযরত সৈয়্যদ বিলায়েত শাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ১৮৯৭ সালে শিয়ালকোট শহরের আমেরিকান মিশন হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলাম। আমি প্রথমে বোর্ডিং হাউজে থাকতাম এরপর আমার ইংরেজী শিক্ষকের সুপারিশক্রমে কজল বাশ এর রঈস আগা মুহাম্মদ ওয়াকার সাহেবের ঘরে তার নাবালক দু'ভাইয়ের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হই এবং থাকার জন্য আমাকে একটি ছোট্ট কামরা দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে আমি পূর্বেই শুনেছিলাম। কিন্তু যেহেতু এই দাবী আমার পূর্ব লালিত বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না তাই গবেষণার প্রতিও মনযোগ দেই নি। এছাড়াও মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এমন ভুলভাবে উপস্থাপন করত যে, আমার এগুলো শুনতেও ঘৃণা হত। কিছুদিন পর শহরে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং ব্যাপকহারে মানুষ মরতে থাকে। একদিন নীচে বাজারে দেখি, অনেকগুলো লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর আত্মীয়স্বজনরা আহাজারী করছিল। এই শিক্ষণীয় দৃশ্য দেখে আমার স্মরণ হল, এটি তো সংক্রামক ব্যাধি, আমিও আক্রান্ত হতে পারি। আল্লাহ্ না করুন, আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে আমার মত এই অযোগ্য বান্দা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কোন্ পুণ্য কাজ উপস্থাপন করবে? পুণ্যকর্ম তো দূরের কথা, শৈশবে নিজ গ্রামের মসজিদে যে কুরআন পড়া শিখেছিলাম তাও চর্চা না থাকার কারণে ভুলে গেছি। কেননা এরপর আর কখনো পড়ি নি। এটিও সত্যকথা যে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, কিন্তু পরকালে এটি জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তুমি ইংরেজি, গণিত প্রভৃতিতে কত নম্বর পেয়েছ? আমি এতই অনুতপ্ত হলাম যে, মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম, যেভাবেই হোক নবোদ্দ্যমে কারো কাছ থেকে শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়া শিখব। প্রথমে আমি নিজে নিজে কুরআন খুলে পড়তে লাগলাম কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলাম না সম্পূর্ণ সঠিক পড়ছি নাকি ভুল পড়ছি। এরপর ভাবলাম, কোন মসজিদের মৌলভীর কাছে গিয়ে পড়ব। কিন্তু একইসাথে এ আশংকাও হলো, ও তো বলবে, তুমি এতো বড় হয়েছ, এখনও কুরআন শরীফ পড়তে জান না! অবশেষে এ বুদ্ধি মাথায় আসল, যদি কোথাও পবিত্র কুরআনের দরস দেয়া হয়, আমি সেখানে গিয়ে বসে কুরআন পাঠ শুনব, আর এভাবে শুদ্ধ ক্বেরাতের পাশাপাশি অনুবাদও শিখতে পারব। চারপাশে অনুসন্ধানের পর জানতে পারলাম, আহমদী মসজিদ ছাড়া আর কোথাও এভাবে দরস দেয়া হয় না। আমি মনে মনে ভাবলাম, শুধুমাত্র কুরআনই শুনব, তাদের বিশ্বাস ও শিক্ষার প্রতি আদৌ মনোযোগ দিব না। যখন আমি সেখানে যাচ্ছিলাম, আগা সাহেব আমাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, তুমি যদি সেখানে যাও তাহলে

অবশ্যই মির্যায়ী হয়ে যাবে। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম, আমি মির্যায়ী হবার জন্য যাচ্ছি না, কেবলমাত্র কুরআন শোনার জন্য যাচ্ছি। তিনি আমার এ কথা মানেন নি। পরের দিন আমি সুযোগ পেয়েই আহমদীয়া মসজিদে পৌঁছি। হযরত মরহুম মীর হামেদ শাহ্ সাহেব তখন দরস দিতেন। আমি যথারীতি প্রতিদিন উপস্থিত হতাম এবং ধর্মীয় জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনতাম। আর যখন হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব কাদিয়ান থেকে এসে দরস দিতেন, তখন তাঁর প্রতাপের কারণে আমার অ-আহমদী শিক্ষকও দরসে উপস্থিত হতেন। যদিও আমাকে বিশেষ কোন তবলীগ করা হয়নি, কিন্তু দরস শুনতে শুনতে আমার সকল সন্দেহের নিরসন হয়। আমি বুঝে যাই, আহমদীয়া জামাতের উপর আরোপিত সকল অপবাদ ভিত্তিহীন। এরমধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। অবশেষে আমি হযরত আকদাসের বরাবরে বয়আতের আবেদনপত্র পাঠাই। কয়েকদিন পর আমার আবেদন গৃহীত হয়েছে এই মর্মে পত্র আসে আর আমার আহমদীয়াতের ক্রোড়ে স্থানলাভের সৌভাগ্য হয়। আমি নিয়ামতের স্মৃতিচারণস্বরূপ এটি উল্লেখ করতে চাই, খোদা তা'লা আমাকে সম্ভ্রান্ত বংশে সৃষ্টি করেছেন, ডাক্তারীর মতো বিখ্যাত পেশায় দক্ষতা লাভের সৌভাগ্য দিয়েছেন আর আমার অধিকাংশ দোয়া কবুল করেছেন, সকল আকাংখা পূর্ণ করেছেন, জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, সন্তান-সন্ততি দান করেছেন। আর সবচেয়ে বড় যে পুরস্কার আমাকে দান করেছেন তাহল, আমি শেষ যুগে আগত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি এবং আহমদী হবার গৌরব অর্জন করেছি। আগা সাহেবের কথাই সত্য হল। (তিনি বলেছিলেন, যেও না, গেলে মির্যায়ী হয়ে যাবে)। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমি সোজা পথে পরিচালিত হয়েছি।

এই কয়েকটি ঘটনা ছিল যা আমি বর্ণনা করলাম। এখন আমি ঐ বিষয়টিও বলতে চাই, জামাত যতই উন্নতি করছে, হিংসুক ও নৈরাজ্যবাদীদের কর্মকান্ডও ততই বেড়ে চলেছে। তারা বিভিন্নভাবে জামাতের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা কখনও চুপিসারে আক্রমন করে, কখনো প্রকাশ্যে, আবার কখনো শুভাকাংখী সেজে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এজন্য প্রত্যেক আহমদীকে শত্রুদের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম' আর 'রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী' দোয়া পড়া উচিত। শত্রুর মোকাবিলায় অবিচল থাকার দোয়া, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ এবং দরূদ শরীফ অনেক বেশি পড়া উচিত, যাতে আমরা শত্রুদের সকল অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারি।

গত কয়েকদিন হল, কোন নৈরাজ্যবাদী ফেসবুকে একদিকে হযরত বাবা নানক সাহেবের ছবি দিয়ে তাঁর বিপরীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেয়। আর অত্যন্ত নোংরা ও অশালীন মনমানসিকতার পরিচয় দিয়ে হযরত বাবা নানকের ছবির উপর অত্যন্ত বাজে ও নোংরা কথা লিখে এবং সেই সাথে ক্রস চিহ্ন এঁকে দেয়। অপরদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্য লিখে (বাবা নানকের সাথে) তুলনা করেছে, তিনিই সত্য এবং তিনি এই তিনি সেই। এটি নিশ্চিত, সে একাজ মন্দ উদ্দেশ্যে এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করা তার উদ্দেশ্য ছিল না বরং শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা তার উদ্দেশ্য ছিল। আর তার চেয়েও গুরুতর অন্যায় করেছে সেখানকার একটি পত্রিকা, যারা এটি ছেপে প্রকাশও করেছে। যারফলে কাদিয়ান এবং আশেপাশের

এলাকাগুলোতে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। যাহোক, এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তাদের নেতৃবৃন্দ বিবেক ও ন্যায়নীতির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করেছেন আর বলেছেন, আহমদীরা এমনটি করতে পারে না। অবশ্যই কোন দুস্কৃতকারী এবং অসৎ প্রকৃতির মানুষ আমাদের মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এমনটি করেছে।

আমার কাছেও কাদিয়ানের শিখ নেতাদের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে। চিঠিতে তারা বলেছে, আমরাও বিশ্বাস করি, কেউ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এমনটি করেছে আর দোষ পড়েছে আহমদীয়া জামাতের উপর। অর্থাৎ এটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন কোন আহমদী তা লিখেছে এবং আহমদীয়া জামাত এটি ছাপিয়েছে। অথচ জামাতে আহমদীয়া কখনোই এমন ন্যক্কারজনক আচরণ করতে পারে না।

যাহোক, ঐসব সম্মানিত ব্যক্তি, তাদের বিভিন্ন সংগঠন এবং আহমদীয়া জামাত সরকারের কাছে দাবী করে যে, বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেয়া হোক। কারো ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে না, এটি জামাতে আহমদীয়ার স্থায়ী অবস্থান। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিষয় তো অনেক বড় কথা, আমরাতো পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষার এর উপর প্রতিষ্ঠিত, "অন্যদের মূর্তি-প্রতিমাকেও গালমন্দ করবে না।" বাবা নানক সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন। আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তকে তাঁর মর্যাদা এবং সম্মান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কোন খাঁটি আহমদী তাঁর সম্পর্কে এমন নীচ, নোংরা এবং কদর্যপূর্ণ কথা বলার বিষয়টি ভাবতেও পারে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাবা নানক সাহেব সম্পর্কে একস্থানে বলেন, **'খোদা তা'লা বাবা নানক সাহেবকে সে সময় সত্য এবং সত্যান্বেষণের প্রেরণা দান করেছেন, যখন পাঞ্জাবে আধ্যাত্মিকতা কমে গিয়েছিল। এথেকে প্রমাণিত হয়, নিঃসন্দেহে তিনি এমন তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা ভেতরে ভেতরে এক খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয়।'**

অপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, **'প্রত্যেক মু'মিন ও মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হচ্ছে, তাঁকে** (অর্থাৎ হযরত বাবা নানক সাহেবকে) **সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা এবং তাঁকে পবিত্র লোকদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত মনে করা। আমাদের মানতে হবে, আমরা যে কাজে নিয়োজিত আছি– বাবা সাহেব সেই প্রকৃত জ্যোতি প্রসারের ক্ষেত্রে যে সাহায্য করেছেন এর জন্য যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হব।'**

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের কাজ এবং হযরত বাবা নানক সাহেবের কাজকে একই প্রকৃতির বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই সেসব ব্যক্তি চরম দুর্ভাগা যারা বাবা নানক সম্পর্কে অপলাপ করে।

তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, **'আমাদের ন্যায়নিষ্ঠবোধ আমাদের একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, নিঃসন্দেহে বাবা নানক সাহেব সেসব প্রিয় বান্দার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাদেরকে খোদা তা'লা স্বহস্তে নূরের দিকে আকৃষ্ট করেছেন।'**

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **'আমি শিখ সাহেবদের সাথে এ বিষয় একমত, বাবা নানক সাহেব প্রকৃত পক্ষে খোদা তা'লার প্রিয়পাত্রদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।'**

তিনি (আ.) বলেছেন, **'এখন জামাতের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা মুদ্রিতও হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বাবা নানক সাহেব খোদার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি তাঁদের অন্তর্ভূক্ত যাদের প্রতি ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয় এবং যারা**

খোদা তা'লার হাতে পবিত্র হন। আমি সেসব লোককে দুস্কৃতকারী ও নীচ জ্ঞান করি যারা এমন কল্যাণমন্ডিত লোকদের কথা বলতে গিয়ে অবমাননাকর ও অপবিত্র ভাষা ব্যবহার করে। মহারাজা রামচন্দ্র ও মহারাজা কৃষ্ণ'রা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন।'

অতএব, যে-ই এ ঘোষণা প্রকাশ করেছে বা এ চিত্র বানিয়েছে, সে দুস্কৃতি ও নৈরাজ্য ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এসব করেছে। কাদিয়ানের ব্যবস্থাপনা পত্র-পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ছাপিয়েছে আর এটিই বাস্তব অবস্থান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিকট বাবা নানকের মর্যাদা অতীব মহান এবং আমরা তাকে খুব সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা সর্ব প্রকার বিশৃঙ্খলা ও দূরভিসন্ধি থেকে কাদিয়ানের আহমদীদের এবং সেখানকার পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখুন এবং শত্রুরা তাদের দুস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডে ব্যর্থ ও বিফল হোক।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে, মোকার্‌রম আব্দুর্ রাজ্জাক বাট সাহেবের যিনি ২০১২ সালের ৬ অক্টোবর ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি যুগপৎ জামাতের মুবাল্লেগ ও মূসী ছিলেন। তার জানাযার নামায সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আঙ্গিনায় পড়া হয়েছে। কোন ঔষধের ভুল প্রয়োগে তার হৃৎপিন্ড প্রভাবিত হয় আর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। নয়তো আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল গোলাম মোহাম্মদ কাশ্মীরী এবং তিনি গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। শৈশব থেকেই তার পিতা নামাযে অভ্যস্থ ছিলেন, এ কারণে নিজ অঞ্চলে মৌলভী নামে অভিহিত হতেন। তিনি ১৯৩০ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন বয়আত গ্রহণ করেন তখন তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন তার স্ত্রীকে তার এক অ-আহমদী বান্ধবী জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি আহমদী হয়ে নামায পড়া ত্যাগ করেছেন? তখন তার স্ত্রী অর্থাৎ রাজ্জাক বাট সাহেবের মা তাকে বলেন, না, নামায তো পূর্বের চেয়ে আরো বেশি পড়েন। তখন তার বান্ধবী বলেন, তবে তিনি কাফির কীভাবে হলেন? এরপর তিনি (রাজ্জাক সাহেবের মা) ফেরত চলে আসেন। তিনিও খুবই পুণ্যবতী নারী ছিলেন।

আব্দুর রাজ্জাক বাট সাহেব গুজরাটের আলমগড় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ১৯৭১ সালে জামেয়ার পড়ালিখা সমাপ্ত করেন এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সেবা প্রদান করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে ঘানায় দায়িত্বে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি বিভিন্ন স্থানে থাকেন। এরপর ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর ১৯৮৯ সালে পাকিস্তান ফিরে আসেন। এরপর পাকিস্তানেই মুরুব্বী হিসাবে দয়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগের অধীনে তরবীয়ত নওমোবাঈন-এ সেবা প্রদান করতে থাকেন। ইসলাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। এখানেও তিনি ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। তাঁর কথা বলার ধরন ও বোঝানোর পদ্ধতি খুব চমৎকার ছিল। নুসরত জাঁহার সেক্রেটারী মোবারক তাহের সাহেব, যিনি তাঁর স্ত্রীর ভাই, লিখেছেন, যখন আমার বোন স্নেহের আমাতুন্ নূর তাহেরের জন্য বাট সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব আসল তখন আমার পিতা হযরত মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেব তখনকার সেক্রেটারী হাদীকাতুল মুবাশ্বেরীন মওলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেবের

সাথে পরামর্শ করেন যে বলুন, কর্মক্ষেত্রে বাট সাহেবের কাজ কেমন? শেখ সাহেব বলেন, তিনি খুব ভাল কাজ করছেন। তার রিপোর্ট খুব ভাল ও সন্তোষজনক। এ রিপোর্ট শুনেই আব্বাজান বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ফিল্ডে তার কাজ আমি দেখেছি, ঘানাতে আমি তার সাথে ছিলাম, তিনি যেমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন খুব কম মুবাল্লেগ-ই এভাবে কাজ করেন। স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তার একান্ত বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক জুমুআতে সব মেয়েদের দাওয়াত দিতেন এবং সবাইকে সাথে নিয়ে জুমআর খুতবা শুনতেন। তিনি তার মায়ের খুব সেবা করেছেন। তিনি তার প্রতিটি সাফল্যের কৃতিত্ব সর্বদা মাকে দিতেন। সর্বদা নিজের সন্তানদেরকে নামায ও দোয়ার বিষয় তাগাদা দিয়ে যেতেন। যে সন্তানরা নামাযী ছিলেন, তাদের সাথে খুবই ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন সন্তোষ প্রকাশ করতেন। তার পাঁচ-ছয় জন মেয়ে ছিল। যখন তার সন্তানদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসত, আর এই প্রস্তাব সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তিনি সর্বদা এ উত্তরই দিতেন, **"ছেলে নামায পড়ে এবং চাঁদা দেয়, তোমাদের আর কি চাই?"** আর একথাও বলতেন, **"যদি আমার মেয়ের ভাগ্যে থাকে তবে খালি ঘরও ভরে দেবে আর যদি ভাগ্যে না থাকে তবে অনেক এমন মেয়েও আছে যারা ভরা ঘরকে খালি করে দেয়।"** এতে সাধারণত সেসব লোকের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যারা প্রয়োজনের তুলনায় জাগতিক বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তিনি খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। তার ছেলের কোন কারণে শাস্তি হয় এবং যতদিন পর্যন্ত সে ক্ষমা পায় নি তার সাথে তিনি কথা বলেন নি এবং বলতেন, **"যখন যুগ খলীফা তার প্রতি অসন্তুষ্ট তখন আমি তার সাথে কীভাবে সম্পর্ক রাখতে পারি?"** ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। তার ছেলেকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তিনি আমার কাছে এর উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। কখনো ঘুণাক্ষরেও এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন নি যে, তাকে ক্ষমা করে দিন। অথবা কোনটা ঠিক বা কোনটা ঠিক নয় (এমন কথাও উঠান নি)। কেবল একথাই বলেছেন, **"দোয়া করুন আল্লাহ তা'লা যেন তাকে সুবুদ্ধি দান করেন।"** সর্বদা জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন এবং সন্তানদেরকেও এর উপদেশ দিয়ে গেছেন। নিয়মিত খুতবা শুনতেন আর যেভাবে আমি বলেছি, কোন সন্তান খুতবার মাঝে উচ্চবাচ্য করলে খুবই অপছন্দ করতেন। অসুস্থাবস্থায়ও সাধারণত ছুটি নিতেন না। যদি কেউ ছুটির ব্যাপারে বলত তবে তিনি বলতেন, **"অফিসে গেলেই সুস্থ হয়ে যাব।"** ছুটি আছে তাই ঘুরতে নিয়ে যান সন্তানেরা কখনো এই মর্মে আবদার করলে বলতেন, আমার জীবন জামাতের জন্য উৎসর্গ করা। আর নিশ্চিত এ বাক্যটি বুলি স্বর্বস্ব ছিল না। তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত জামাতের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং তা পালন করে দেখিয়েছেন।

যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, আফ্রিকাতে আমি তার সাথে ছিলাম। তখনকার অবস্থাও বর্তমান অবস্থার অনেক তফাত রয়েছে। অতি সংকটময় অবস্থা ছিল তাসত্ত্বেও খুবই উৎফুল চিত্তে তিনি সেখানে দিন কাটিয়েছেন। অধিকাংশ সময় অসুস্থ হয়ে পড়তেন, ম্যালেরিয়া হয়ে যেত। হাসপাতালে ভর্তি হতেন, কিন্তু যখনই সুস্থ হতেন কালবিলম্ব না করে কাজে যোগ দিতেন। স্থানীয়দের প্রতি ভালবাসার (আচরণের) কারণে মানুষ তাকে খুবই পছন্দ করত। আমি যখন সেখানে গিয়েছি, তিনি মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি স্থানীয় পরিস্থিতি সহ আরো অনেক বিষয় আমাকে অবহিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন। এভাবে আমাকে প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি স্নেহ ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার প্রতি রহমত এবং বরকত

অবতীর্ণ করুন। নিজ প্রিয়দের মাঝে তাকে স্থান দিন। তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদেরকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দিন। তাঁর এক ছেলে জামাতের মুবাল্লেগ হিসেবে সিয়েরালিওনে কর্মরত আছেন আর তাঁর স্ত্রীও সেখানে। তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ধরার শক্তি দিন।

আমি এ এখন দ্বিতীয় যে জানাযা পড়াবো তাহল, শ্রদ্ধেয়া ডা. ফাহমিদা মুনীর সাহেবার। ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে তিনি কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । ১৯৬৪ সালে তিনি লাহোরের ফাতেমা জিন্নাহ্ মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS পাশ করেছেন। হাউস জব করার পর উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে গাইনি বিভাগে ডাক্তারের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে ফযলে ওমর হাসপাতালে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন সেবা দান করেছেন। তার সেবার ঘটনা পড়তে গেলে সম্ভবত একটি খুতবার পুরো সময় দরকার হবে বরং বেশি সময় লাগতে পারে। ১৯৬৪ সালে লাহোরের এচিসান হাসপাতালে হাউস জব করছিলেন। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডে চাকরির উদ্দেশ্যে আবেদন করেছিলেন আর নিযুক্তি পত্রও হস্তগত হয়। টিকিটের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড যাত্রার পুরো প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। পরবর্তী দিন যখন ঘরে 'আল্ ফযল' পত্রিকা আসে, তাতে রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার প্রয়োজন বলে বিজ্ঞাপন দেখতে পেলেন। এর সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বার্তা দেখেন, **"ফযলে ওমর হাসপাতালে যদি কোন আহমদী মহিলা ডাক্তার না আসে তবে কোন খ্রিস্টান মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করার ব্যবস্থা নিন।"** দশজন ভাই-বোনের বড় পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি লন্ডন যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তার বাবা সেকশন অফিসার ছিলেন তাসত্ত্বেও আর্থিক দৈন্যতা ছিল। তার বাবা ঋণ করে তাকে MBBS কোর্স সম্পন্ন করান। এরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি সে দিনগুলোতে লাহোর থেকে রাবওয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। যে হাসপাতালে হাউস জব করতেন সেখানকার কর্মকর্তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। এম এস তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন চলে যাচ্ছ? সেখানে কত টাকা বেতন পাবে? ডা. ফাহমিদা সাহেবা বলেন, হয়ত মাসিক ২৩০ টাকা বেতন পাব। এম এস সাহেব বলেন, আমি তোমাকে সাড়ে পাঁচশত টাকা বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করছি তবুও লাহোর ছেড়ে যেও না। তোমার ভবিষ্যত এই হাউস জবের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবও গ্রহণ করেন নি বরং বলেন, আমি অর্থের লোভে যাচ্ছি না কেননা আমার জন্য ইংল্যান্ডেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে আবার টিকেটও কাটা আছে, তাছাড়া সেখানে ভর্তির কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অমি এসব কিছু ছেড়ে রাবওয়া যাচ্ছি। এর প্রতি উত্তরে এম এস বললেন, আপনি অনেক মহান মহিলা, যে নিজের জামাতের জন্য ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এম এস তাকে তার সর্বোত্তম হাউস জবের এসিস্ট্যান্ট হিসেবে সনদ প্রদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬৪ সালে রাবওয়া চলে আসেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফযলে ওমর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার হিসেবে সেবা করার সুযোগ পান। তৎকালীন সময় রাবওয়ায় এবং এর আশেপাশেও কোন মহিলা ডাক্তার ছিল না । একটি বিশাল অঞ্চলজুড়ে তাকে একা দায়িত্ব পালন করতে হত। শীত হোক বা গ্রীষ্ম, রাত দু'টা বা তিনটা যখনই কোন রোগী আসত তিনি দ্রুত বিছানা ছেড়ে রোগী দেখতেন। তার ব্যাপারে এটিও জানা যায় যে, তিনি ওলিমার দিন বধুবেশে স্টেজে বসে ছিলেন তখন হাসপাতাল থেকে অতীব জরুরী সংবাদ আসে! তখন তিনি সেই পোশাকেই সেখান থেকে উঠে হাসপাতালে চলে যান। নিমন্ত্রিত অতিথিরা তার অনুপস্থিতিতেই খাবার

খান। যাহোক, এই ছিল তার ত্যাগের বৈশিষ্ট্য, তিনি ওয়াকফের প্রেরণার সমৃদ্ধ হয়ে সেবায় ব্রতী হয়েছেন। আল্লাহ্ সকল ওয়াকেফীনকে এ দৃষ্টান্ত অনুকরণের সৌভাগ্য দান করুন। গরীবদের প্রাণখুলে সাহায্য করতেন। বিনামূল্যে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দিতেন। সেই অঞ্চলের রীতি হল, লোকেরা নিজেদের সমস্যা বলতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিত। কিন্তু তিনি কখনো এ ধরনের কথা বলেন নি, সে মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী— তা তদন্ত করব। যে যাই বলেছে চোখ বুজে বিশ্বাস করে বিনামূল্যে চিকিৎসাও করতেন আবার ঔষধও দিয়ে দিতেন। তার স্বামী বর্ণনা করেন, অনেকবার এমনও হয়েছে, তিনি হাসপাতালে রাত কাটাতেন এবং সকালে স্বামীর কাজে যাবার সময় তিনি হাসপাতাল থেকে ফেরত আসতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) শূরায় পর্দার ব্যাপারে তার উদাহরণ দিয়েছেন। যদি কেউ পর্দার ভেতরে থেকে কাজ করতে চায় তাহলে ডাক্তার ফাহমিদার কাছ থেকে শিখুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আহে.) বলেন, খুবই ত্যাগী মনমানসিকতার অধিকারীনি মহিলা আর খুব কম মানুষই এরূপ যোগ্যতা লাভ করতে পারে। ১৯৬৪ সালে হাসপাতালে যোগদানের পর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান, হযরত আপা উম্মে মতীনও সেখানে ছিলেন। তিনি বলেন, ফযলে ওমর হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার এসেছেন শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দ্রুত আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তার জন্য অনেক দোয়া করেন। একবার তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় বলেন, আমি এত্বেকাফে বসতে চাই; উত্তরে হুযূর বলেন, আমার রোগী দেখ— আর আমি তোমার জন্য অনেক দোয়া করব। এটিই তোমার এত্বেকাফ। খিলাফতের সাথে তার খুবই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এবং অত্যন্ত সাহসী মহিলা ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার রচিত কবিতা খুবই পছন্দ করতেন। কেবল ডাক্তারই ছিলেন না বরং অনেক বড় মাপের কবিও ছিলেন। তার কবিতা ছিল কৃত্রিমতামুক্ত এর সাথে পূর্ণতা আর আবেগও ছিল। তার সাতটি কবিতার সংকলন ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিজরতের পরে এখানে এলে তিনি একটি কবিতা লিখে পাঠান। আর এর একটি পঙক্তি ছিল, **"দীর্ঘ দিন ধরে ঘরে তালা ঝুলছে, তাঁকে বলে দাও সে যেন নিজের ঘরে ফিরে আসে।"** হুযূর (রাহে.) এই পঙক্তির জন্য তাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, দাদীমার ন্যায় ডাক্তার ফাহমিদার এই শাসন আমার খুব ভাল লেগেছে। সর্বদা তিনি নিজের সন্তান ও ভাই-বোনদের উপদেশ দিতেন, যদি পৃথিবীতে সম্মান পেতে চাও তাহলে খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখ আর নিজের অস্তিত্বকে এ পথে বিলীন করে দাও। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা যিনি বর্তমানে হাসপাতালের ডাক্তার, ফযলে ওমর হাসপাতালের ইনচার্জ, তিনি বলেন, ডা. ফাহমীদা খুবই ধৈর্যশীলা ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারীনি ডাক্তার ছিলেন। তখন প্রতিকূল অবস্থা ছিল আর সুযোগ-সুবিধাও ছিল অপ্রতুল। কিন্তু গভীর একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। নিজের কাজে খুবই দক্ষতা ছিল তার। রোগীদের সাথে একান্ত স্নেহসূলভ ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। রোগীরা আজও তাকে স্মরণ করেন। বর্তমানে ডাক্তার নুসরাত জাহান সেখানে রয়েছেন তিনিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন এবং ফযলে ওমর হাসপাতালে ডাক্তারের যে ঘাটতি রয়েছে তাও দূর করুন। সেখানে যে গুটিকতক ডাক্তার আছেন তাদের হাতে রোগীদের আরোগ্য নিশ্চিত করুন । তাদের দৃঢ় মনোবল এবং সাহস দান করুন। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবাও দোয়া পাবার অধিকার রাখেন। একবার

সেখানে একটি নযম লিখার প্রতিযোগিতা হয়। এতে নাম ঠিকানাও লিখতে বলা হয়। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, এটিই তার বৈশিষ্ট্য। কবিতার শেষে তিনি নাম ঠিকানার স্থানে লিখেন, **'সৃষ্টির সেবা, লেখালেখী, ঘরের দেখাশুনা (হাউজ ওয়াইফ) শুভ পরিণতির জন্য দোয়া প্রার্থী।'** এটি কেবল কথার কথা নয় যেমন কিনা আমি বলেছি, নিঃস্বার্থ মহিলা ছিলেন, এবং তিনি নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন। এ লেখায় তিনি নিজের জীবনের সারাংশ তুলে ধরেছেন। সত্যিই তিনি সৃষ্টির সেবিকা ছিলেন এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনকারীনি ছিলেন। আত্মবিশ্লেষণ করতেন। তিনি মানব হিতৈষী ছিলেন। আমি মনে করি, তার পরিণতিও উত্তমই হয়েছে। কেননা হাদীস অনুযায়ী মানুষ যদি কারো প্রশংসা করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় আর তিনিও ঐসব মানুষের একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকে মায়ের পুণ্য কর্মসমূহকে তাদের নিজ নিজ জীবনে রূপায়ন ও চলমান রাখার সামর্থ দান করুন। তার স্বামীকে ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সাহস দিন।

তৃতীয় জানাযা যা জুমুআর নামাযের পর পড়ানো হবে তা হচ্ছে, মোকাররমা নাসীরা বিনতে যারিফ সাহেবার যিনি হায়দ্রাবাদের শহীদ ডাক্তার আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। নরওয়েতে বসবাস করতেন। তিনি গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার মা ফাতিমা জামিলা সাহেবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সাইয়্যেদা সারাহ্ বেগম সাহেবার ফুফাত বোন ছিলেন। তার পিতা জনাব মুহাম্মদ যারিফ সাহেব মরহুমকে আল্লাহ তা'লা তের বছর বয়সে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। এ কারণে তাকে খুব অল্প বয়সেই বিভিন্ন সমস্যা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মরহুমার বিবাহ ১৯৪৯ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত প্রফেসর আব্দুল কাদের সাহেবের ছেলে মোকাররম ডাক্তার আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের সাথে সম্পন্ন হয়। খুবই অতিথিপরায়ণ মহিলা ছিলেন। স্বামী ডাক্তার আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের নিকট আগত অসংখ্য অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনকে তিনি মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করতেন। নামাযী, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জ্ঞানপিপাসু মহিলা ছিলেন। এ পরিবারও জ্ঞানপিপাসু, মাশাআল্লাহ্। অভাবীদের অভাব মোচন ও তাদের সাহায্য করার চেষ্টায় রত থাকতেন, যেন তাদেরকে মানুষের কাছে অভাবের কথা বলতে না হয়। তিনি যে কোন কাজ শিখার আগ্রহ রাখতেন। তিনি সাহিত্য বিষয়ক পরীক্ষায় পাশ করেছেন। সন্তানদেরকেও উত্তম শিক্ষা দানের চেষ্টা করেছেন। ১৯৮৫ সালে স্বামীর শাহাদতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাকে ১৯৮৭ সালে নরওয়েতে হিজরত করতে হয়। যদিও তার বয়স ষাট বছর ছিল এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন কিন্তু তাসত্ত্বেও নরওয়ের ভাষা শেখার চেষ্টা করেছেন। জামাত ও খিলাফতের সাথে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাদি ও জামাতের পুস্তক-পুস্তিকা সর্বদা তিনি অধ্যয়ন করতেন। যথাসময় চাঁদা প্রদানের বিষয় সর্বদা সচেতন থাকতেন। তার দুই ছেলে ডাক্তার। একজন মেয়েও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সন্তানদেরকেও তার উত্তম গুণাবলী ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)